জল পড়ে পাতা নড়ে

আর্থার উইনস্টনের জীবন ও আজকের পৃথিবী

মুহম্মদ জুবায়ের

আর্থার উইনস্টন নামটি অপরিচিত লাগতে পারে। কোনো বিচারেই বিখ্যাত মানুষ তিনি নন। কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান এই ভদ্রলোক অল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর তিনটি ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ বছর মার্চের ২২ তারিখে তিনি ১০০ বছরের জন্মদিন উদযাপন করেন। তার পরদিন লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি মেট্রো ট্রানজিট অথরিটিতে (এমটিএ) এক নাগাড়ে ৭০ বছর চাকরি করার পর অবসর নেন। অবসর জীবনের ঠিক তিন সপ্তাহের মাথায় এপ্রিলের ১৩ তারিখে ঘুমের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যু মনুষ্যজীবনের অনিবার্য পরিণতি, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃত্যুতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। তবু এতো দীর্ঘ আয়ুতে অবসরজীবনের দৈর্ঘ্য মাত্র তিন সপ্তাহের, তা কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর, খানিকটা বিষাদেরও। তবু মৃত্যুর ঘটনা বাদ দিলে বাকি দুটিকে অসাধারণ যে বলা চলে, তাতে সন্দেহ নেই। শতবর্ষের আয়ুর মুখ খুব বেশি মানুষের দেখা হয় না, তা-ও আবার চাকরি করার মতো কর্মক্ষম অবস্থায়। আর একই কর্মস্থলে টানা ৭০ বছর যুক্ত থাকা, সে-ও একটি কীর্তি বটে। হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, এই কর্মে আর্থার নিযুক্ত হয়েছিলেন যখন তাঁর বয়স তিরিশ। অতো বছর ধরে একটি পেশায় কর্মরত থাকা দূরে থাক, ৭০ বছর বয়সে পৌঁছাতে পারে ক'জন? তার আগেই অনেক মানুষ ধরাধামের মায়া ত্যাগ করে, অনেকে টিকে গেলেও চলৎশক্তিহীন হয়ে যায়, রোগবালাই নিয়ে বসবাস করে। বাংলাদেশে তো বটেই, আমেরিকায় যেখানে গড় আয়ু আমাদের তুলনায় বেশি, সেখানেও এই ঘটনা ব্যতিক্রম।

আর্থারের কীর্তির কাহিনী এখানেই শেষ হয় না, এক নাগাড়ে ৭০ বছর চাকরি করার দুর্লভ ঘটনার অভ্যন্তরে আরেকটি অনন্যসাধারণ কীর্তি আছে। সেটিই হয়তো তাঁর উজ্জ্বলতম অর্জন। শেষ কর্মস্থলে এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কাজে অনুপস্থিত ছিলেন একটিমাত্র দিন। ১৯৮৮ সালে, অবসরে যাওয়ারও ১৮ বছর আগে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্যে। অনুমান করি, প্রাপ্য বাৎসরিক ছুটিগুলি তিনি ভোগ করেছিলেন। কিন্তু এর বাইরে ৭০ বছরে কাজে অনুপস্থিত না থাকা – ভাবা যায়! বছরে দু'একবার সর্দি-জ্বর সবারই হয়, আত্মীয়-পরিজন বা প্রতিবেশীর বিপদে-আপদেও মানুষ এক-আধদিন ছুটি নেয়, কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকে। সামান্য গা ম্যাজম্যাজ করলে আমরা কমবেশি সবাই কাজে অনুপস্থিত থাকার অজুহাত পেয়ে যাই। বাংলাদেশ বৃষ্টির দেশ, বর্ষাকালে বৃষ্টির অজুহাতে কাজ কামাই করেননি এমন শহুরে মানুষ হয়তো একজনও পাওয়া যাবে না। মার্কিনিরা যে এ ক্ষেত্রে খুব ব্যতিক্রম, তা বলা যাবে না। কাজে অনুপস্থিতির জন্যে অজুহাতের অভাব কোনোদিন কোনো দেশে হয়নি, হবেও না। সেই বিচারে ৭০ বছরের মধ্যে কর্মস্থলে একদিন ছুটি নেওয়ার এই কীর্তিকে অ-মানুষিক বা অতিমানবিক বললেও হয়তো বেশি বলা হয় না। আর্থার উইনস্টন এমনই এক ব্যতিক্রমী কীর্তির অধিকারী।

অসামান্য এই কীর্তির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৭ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন শতাব্দীর সেরা কর্মী (এমপ্লয়ী অব দ্য সেঞ্চুরি) হিসেবে সম্মানিত করেন আর্থারকে। ওই একই বছরে কর্মস্থলে আর্থার উইনস্টনকে সম্মানিত করা হয় তাঁর নামে একটি বাস ইয়ার্ড-এর নামকরণ করে। মার্কিন

শ্রম দফতরের একজন মুখপাত্র বলেন, এতো দীর্ঘ সময় একনাগাড়ে কাজ করার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ তাঁদের জানা নেই।

আমেরিকার মধ্যস্থলে ওকলাহোমা রাজ্যে এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান আর্থার। মাত্র দশ বছর বয়সে কর্মজীবনের শুরু, খামারে তূলা সংগ্রহকারী হিসেবে। অনুমান করা যায়, সেই সময় শিশুশ্রম নিয়ে আমেরিকায়ও কেউ মাথা ঘামাতো না। প্রচণ্ড খরা ও ঝড়ে পরপর কয়েক বছর ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে অভাব তীব্রতর হয়। সচ্ছলতর জীবনের আশায় তাঁর পরিবার আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দিকে চলে যায়। ১৯২৪ সালে আর্থার চাকরি পান প্যাসিফিক ইলেকট্রিক রেলওয়ে কোম্পানিতে, যা পরবর্তীতে এমটিএ-তে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৮-এ চাকরি ছেড়ে দেন, কিন্তু ফিরে আসেন কয়েক বছর পরে। তারপর আর কোথাও যাননি, সেখানেই তিনি বাকি জীবন কাজ করেছেন। অবসর নেওয়ার কালে তাঁর অধীনে ছিলো এগারোজন কর্মীর একটি দল, যাদের কাজ মেট্রোর বাসগুলির দেখাশোনা ও দরকারমতো মেরামত করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জ্বালানি তেল ভরা।

প্রতিদিন ভোরে ধোপদুরস্ত পোশাক পরে কাজে বেরোতেন, মাথাটি থাকতো উঁচু, চোখ সামনের দিকে। ঘড়ি ধরে নির্ধারিত সময়ের ঠিক পনেরো মিনিট আগে ১৯৭৮ মডেলের কাটলাস গাড়িটি নিয়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হতেন। তাঁর জন্যে নির্ধারিত জায়গায় গাড়ি পার্ক করে নিজের নীল ইউনিফর্মটি ঠিকঠাক আছে কি না আরেকবার দেখে নিতেন। শুরু হতো আরেকটি কর্মদিবস।

ইতিহাসের কতো বাঁকের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি, দুই দুটি বিশ্বযুদ্ধ গেছে, নিজদেশে বর্ণবাদের কুৎসিত মুখ দেখেছেন। তবু নিজের ও প্রতিপার্শ্বের মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি, মনের প্রশান্তি ও সক্ষম তারুণ্যকে বিসর্জন দেননি শতবর্ষী এই যুবক। অবসর গ্রহণের পরে বলেছিলেন, 'আর কী, যথেষ্ট হলো তো।' বিনয়ী আর্থার নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'আমি শুধুমাত্র একজন খেটে খাওয়া মানুষ, এই আমার পরিচয়। এর চেয়ে বেশি বা কম কিছু নয়। আর সঠিক জীবনযাপনের শিক্ষা আমার বাবার কাছে পাওয়া। সারাজীবন তাই মেনে চলেছি।' নিজের মতামত প্রকাশে অকুণ্ঠ আর্থারের কাছে পরামর্শ নিতে আসতো অনেকে, তাদের মধ্যে যুবাবয়সীরা যেমন থাকতো, তেমনি ৬০-৭০ বছর বয়সী মানুষও কম ছিলো না। আর্থারের প্রজ্ঞা ও অভিমত তাদের সহায়ক – হোক তা রাজনীতি বা সমাজ কিংবা টাকাপয়সাঘটিত কিছু।

আর্থারের প্রধানতম বিশ্বাস ও আস্থা ছিলো কর্মে। জানিয়েছেন, 'একবার কাজ বন্ধ করে দিয়েছো তো তুমি জন্মের জন্যে তুষারিত, অথর্ব হয়ে গেলে। ক্রমাগত কাজ করে যাও, নিজেকে সচল রাখো। আমার দীর্ঘ জীবনের রহস্য কিন্তু এর বাইরে কিছু নয়।' তাঁর মতে মানুষের জীবনে চাহিদা সীমিত রাখা উচিত। অযথা ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তোলা, দামী গাড়ির মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা একেবারে অর্থহীন। মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল ও তেলেভাজা খাবার, শরীরচর্চা ও পিলভক্ষণের বাড়াবাড়ি বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করতেন তিনি। কারণে-অকারণে ওষুধ সেবনের ঘোর বিরোধী আর্থার, নিজের অসুখ-বিসুখ করলে কয়েক চামচ ক্যাস্টর অয়েল সেবন করে সেরে উঠতেন বলে জানিয়েছেন। বলতেন, 'আজকাল যে মানুষ এমন মুড়ি-মুড়কির মতো পিল খায়, এমন আমি জীবনে দেখিনি। তবু মানুষ এখন কেবলই অসুখে ভুগছে বলে মনে হয়, আগে কিন্তু এমন ছিলো না। আমার তো ধারণা, ওষুধগুলি রোগ নিরাময় না করে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

শরীরে বাহিত পূর্বপুরুষের জিন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ওষুধপত্র থেকে দূরে থাকা বা নির্ভেজাল ইচ্ছাশক্তি যাই হোক না কেন, আর্থার যাপন করে গেছেন একটি পরিপূর্ণ ও প্রশান্তিময় জীবন। চারপাশের অনেককিছু বিষয়ে তাঁর অসন্তোষ ছিলো। যেমন, ইরাক নিয়ে বুশ প্রশাসনের কর্মকাণ্ড খুবই অপছন্দ

করতেন, আমেরিকার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কালো মানুষদের অধিকার ও অবস্থান নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অথচ এইসবের কোনোকিছুই তাঁকে তিক্ত করে তোলেনি। আস্থা রেখেছেন মানুষের মর্যাদায় ও কর্মে। নিজের সাধ্যমতো কর্তব্য করেছেন – শুধু কর্মস্থলে নয়, সামাজিক জীবনেও। এমন প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন ক'জন মানুষ পায়?

নিজেদের চারপাশে তাকিয়ে দেখলে আর্থার উইনস্টনকে রূপকথার চরিত্র বলে মনে হয়। আমাদের কালের অস্থির পৃথিবী ও সমাজ-বাস্তবতায় আত্মতৃপ্ত ও প্রশান্ত জীবনযাপন যে অতি দুরূহ কাজ, তাতে সন্দেহ কি? আমাদের পিতৃপুরুষরা কিছুটা পেরেছেন। তার দুই-তিন পুরুষ পূর্ববর্তীরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী। জীবনভর তাঁরা কৃষিকর্মে জীবন নির্বাহ করে গেছেন। সব বদলে যেতে শুরু করলো নগরকেন্দ্রিক জীবনের প্রসারের হাত ধরে, যে জীবন মানুষকে স্থির থাকতে দেয় না কিছুতেই। আলগা করে দেয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত। অর্থ-বিত্ত-প্রতিপত্তি তখন মোক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ক্রমাগত স্থানবদল, সাফল্য ও অর্জনের ইঁদুর-দৌড়ে শামিল হওয়াই আমাদের নিয়তি। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, আমাদের জীবন এই গন্তব্যে এসে উপনীত হয়েছে।

জুন ২০০৬

email : mz1971@gmail.com